ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠণের সমস্যা—জাতীয় সমস্যা

★ গণরাষ্ট্র কায়েম করার পথেই প্রদেশ গঠণের সমস্যার সমাধান সম্ভব ★

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম,এল,এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা | সোমবার, ১৩ই অক্টোবর ১৯৫২, ২৭শে আশ্বিন ১৩৫৯ | মূল্য—এক আনা

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন একটি জাতীয় সমস্যা। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন বলতে শুধুমাত্র একই ভাষাভাষী অঞ্চলকে এক প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা বোঝায় না; প্রদেশ গর্ণগঠনের প্রশ্নকে সঠিক ভাবে বিচার করতে হলে একই ভাষাভাষী অঞ্চল, অর্থ নৈতিক অচ্ছেদ্যতা (Economic Integrety) ও আচার, ব্যবহার প্রভৃতির দৃঢ় একাত্মতা—সমস্তকে মিলিয়েই চিন্তা করা উচিত। এই প্রদেশ পুর্ণগঠনের প্রশ্নকে শুধু যে কোন একটি প্রদেশের স্বার্থে চিন্তা করা অন্যায়—সমস্ত জাতীয় অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে জাতীয় কল্যানের পরিপ্রেক্ষিতেই একে পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন। পুর্ণগঠনের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট প্রদেশ সমূহের মেহন্নতী জন সাধারণের স্বার্থ একই সাথে প্রতিষ্ঠা করাই এর ভিত্তি।

প্রথমেই চিন্তা করা দরকার যে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ সমূহের পুনর্গঠন করতে হলে জনসাধারণ রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতিরেকে তা করতে পারে না; কিন্তু বর্তমানে দেশের সরকার কাহারা পরিচালিত করছে? জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিভূ যে কংগ্রেসী সরকার জনতার দাবীকে প্রতিনিয়ত পদদলিত করছে যদি সেই ধনিক প্রতিভূ কংগ্রেসী সরকারের নেতৃত্বে প্রদেশ পুণর্গঠন হয় তবে সেটা কখনই জন স্বার্থকে রক্ষা করতে পারেনা। বর্ত্তমানে এদাবী কংগ্রেসী মহলে যে ভাবে উত্থাপিত হয়েছে তার পেছনকার ষড়যন্ত্রকে পরিস্কার বোঝা দরকার। জন সাধারণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে এই দাবী নিয়ে এক ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা চলেছে। শুধু মাত্র সরকারই নহে—অন্যান্য কিছু কিছু হীন স্বার্থন্বেষী গোষ্টীও এই দাবীকে জনসাধারণের অন্যান্য মৌলিক দাবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে জনতাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে।

জন সাধারণের পরিস্কার বোঝা দরকার যে প্রদেশ পুণর্গঠনের ওপর তাদের মূল অর্থ নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান নিভর করেনা। উপরোক্ত সমস্যা সমূহের সমাধান একমাত্র নিহিত আছে পুঁজিবাদ, সামন্ততন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ব্যাপক গণ আন্দোলনে। এদিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টীপাত না করে প্রদেশ পুণর্গঠনের প্রশ্ন তোলার একমাত্র অর্থ হচ্ছে মূল আন্দোলন থেকে জনতাকে কিছুদিনের জন্য বিপথে পরিচালিত করা। আর চেষ্টাও চলেছে তাই। মূলতঃ একই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শোষনের অংশীদার হয়েও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিহার সরকারের ভেতর যে পারস্পরিক বাকবিতণ্ডার মহড়া চলেছে তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের জন সাধারণকে প্রাদেশিকতার মোহে আচ্ছন্ন করে কোন সংঘর্ষে আবদ্ধ করা যায় কিনা তার চেষ্টা করা। ধীর মস্তিস্কে চিন্তা না ক'রে এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে, যদি এপ্রচেষ্টা প্রাদেশিক দাঙ্গায় পর্য্যবসিত হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের ট্রেডইউনিয়ান ও অন্যান্য গনতান্ত্রিক আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি সাধন হবে এবং এই ভাবে কংগ্রেসী সরকারের স্বার্থই পরোক্ষ ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এতে না হবে পুণর্গঠন না হবে কোন সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান।

তাই প্রদেশ পুণর্গঠনের দাবী তোলার আগে খুব সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোভাবকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে হবে। যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তার প্রতিভূ বিধান রায় গত কয় বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ জনসাধারণের রক্ত শোষন করেছেন—যে সরকার তার ইতিহাসে কোথায়ও জনস্বার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেননি সেই বিধান সরকার আজ হঠাৎ বাঙ্গালী দরদী কি করে হলেন সেটা বোঝার প্রয়োজন আছে। ক্রমবর্দ্ধমান শোষনে জর্জরিত জাগ্রত গণচেতনার আঘাতে বিধান সরকারের মুখোস যে বহুলাংশে অপসারিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এহেন মূহুর্ত্তে তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন কি করে পশ্চিমবঙ্গবাসীর সমর্থন লাভ করা যায় অথচ ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে বিন্দুমাত্র আঘাত না লাগে। প্রদেশ পুণর্গঠনের সুবর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছেন এবং তার মারফৎ প্রাদেশিকতার বিষ ছড়াবার চেষ্টা করছেন। ঠিক একই ভাবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপরিষদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র কুৎসা করে বিহারের জনসমর্থন আকর্ষণের চেষ্টা করছেন।

ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার পরিস্কারভাবে দেশবাসীকে জানিয়ে দিতে চায় যে প্রদেশ পুণর্গঠনের প্রশ্নেও পশ্চিমবাংলা ও বিহারের অধিবাসীদের স্বার্থের কোন সংঘাত নেই। এই দুই প্রদেশের মেহন্নতী জনসাধারনের পারস্পরিক সহযোগীতার মারফৎই এই সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। দেশ জোড়া পুঁজিবাদী, সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্যান্য প্রদেশের শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত ও অগণিত শোষিত জনসাধারণের সম্মিলিত আন্দোলনের মারফৎ সাত্যকারের গণরাষ্ট্র কায়েম করার পথেই প্রদেশ পুণর্গঠনের সমস্যার সমাধান সম্ভব। এর জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকলে চলবেনা, ধণিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত সরকার জনস্বার্থের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গীতে এদাবী মানতে পারে না—তাই প্রয়োজন, এদাবীর পেছনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জনমত সংগঠিত করা। জন সাধারণকে এ দাবীকে নিজের দাবী হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং তার মূল অর্থ নৈতিক সমস্যা সমাধানের পথেই এই দাবীকে পরিচালিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রদেশ সমূহের আপামর জন সাধারণের পারস্পরিক সহযোগীতা ও ব্যাপক মতামত গ্রহণের মারফৎই এ সম্পর্কে বিশদ প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব এর আগে নয়। সুতরাং সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেই অগ্রসর হতে হবে।

এশিয়া শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর পিকিং যাত্রা

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারতের প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্যতম কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এম, এল, এ বিমানযোগে পিকিং যাত্রা করিয়াছেন। পিকিং শান্তি সম্মেলনে সারা এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশ সমূহের শান্তি আন্দোলনের ধারা ও গতি প্রকৃতি আলোচনার উদ্দেশ্যে ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের নেতা কমরেড ব্যানার্জী যে তথ্য উত্থাপন করিবেন তাহা লিপীবদ্ধ আকারে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের পূর্বাহ্নেই দেওয়া হইয়াছে।

ভারতবর্ষের শান্তি আন্দোলনে বর্তমান নেতৃত্বের দুর্বলতা, শান্তি আন্দোলনের ব্যাপকতর ভিত্তি সঙ্কুচিত ও সঙ্কীর্ণ করার জন্য দায়ী ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির দলীয় রাজনীতির তীব্র সমালোচনা ও শান্তি আন্দোলনের ব্যাপক ভিত্তি রচনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্য্যকলাপের বিশদ বিবরণ সহ ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের স্মারকলিপীটি লইয়া কমরেড ব্যানার্জীর সাথে অন্যান্য দেশের মধ্যে নয়া চীনের শান্তি আন্দোলনের নেতা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নেতার নামই উল্লেখযোগ্য।

কমরেড ব্যানার্জী পিকিং সম্মেলনের পরে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ সফর করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

★ ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী কংগ্রেসী সরকারের পুনর্ব্বাসন

আপোষ রফার মধ্য দিয়া কংগ্রেস ও মুসলীমলীগের হাতে দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের শাষণ ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ সমাধা হইল বটে, কিন্তু দেশবিভাগ জনিত উদ্বাস্তু সমস্যা ভারতবর্ষের সমাজ জীবনকে, ধর্ম্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে, চরম বিপর্য্যয়ের মুখে ঠেলিয়া দিল। মহাত্মাজী হইতে সুরু করিয়া ছোট বড় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ঘোষনা করিলেন সেদিন যে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের সমস্ত দায়িত্ব কংগ্রেস সরকার লইবে। দলে দলে উদ্বাস্তুরা যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে পশ্চিম বঙ্গে আসিতে লাগিল, যার ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা এক তীব্র রূপ নিল পশ্চিম বাংলায়। যদিও সরকারী বর্ত্তমান আদম সুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম বাংলায় বর্ত্তমান উদ্বাস্তুর সংখ্যা ২০·৪ লক্ষের মত কিন্তু বেসরকারী মতে এই সংখ্যা হইতেছে ৫০ লক্ষের কাছাকাছি। ইহা ভিন্ন আছে দাঙ্গার ফলে বিপর্য্যস্ত মুসলমান উদ্বাস্তু।

স্বয়ং কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রী অজিত প্রসাদ জৈনও কিছুদিন পূর্ব্বে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "পশ্চিম বাংলার প্রতি ১২ জন অধিবাসীর মধ্যে ১ জন উদ্বাস্তু"। একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে এই বিরাট সংখ্যক দেশবাসীকে সমাজ জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করাইতে না পারিলে জাতীয় জীবন বিপর্য্যস্ত হইতে বাধ্য। সুতরাং আমাদের দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে যে এই বিরাট সমস্যার সমাধান করিতে হইবে তাই নয়, সুপরিকল্পিত ভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া এই ৫০ লক্ষ ছিন্নমূলকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়াই দেশকে আগাইয়া লওয়া সম্ভব। এই ৫০ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে বাংলা দেশের সর্ব্বস্তরের লোকই আছেন। যদিও আজপর্য্যন্ত এ সম্পর্কে সরকার কোন উপযুক্ত পরি সংখ্যান (Statistics) প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু বিভিন্ন উদ্বাস্তু উপনিবেশ ও অন্যান্য স্তরের বাস্তুহারাদের নিকট হইতে বেসরকারী মতে যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে আছেন ৪ লক্ষের উপর কৃষক পরিবার সাধারণ আয় সম্পন্ন ৪ লক্ষের উপর মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার, ২০ হাজার শিক্ষক পরিবার, ২৫ হাজার জেলে ও তাঁতী পরিবার, হোমিওপ্যথি, কবিরাজী, এলোপ্যাথি প্রভৃতি ১০ হাজার চিকিৎসক পরিবার, উকিল মোক্তার প্রভৃতি আইন-জীবি ৪ হাজার পরিবার, দাড়ী মাঝি প্রভৃতি ৮ হাজার পরিবার, ২ লক্ষ পরিবারের উপর নাপিত ধোপা, কামার, কুমার প্রভৃতি। এছারা রহিয়াছে ৪॥০ লক্ষের মত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু ছাত্র।

সরকার প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে তাহারা উদ্বাস্তুদের জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন এবং সমস্যা নাকি প্রায় সমাধান হইতে চলিয়াছে। এখন দেখা যাক সরকার বাস্তুহারাদের জন্য কি করিয়াছেন। ১৯৫২ সালের ১৬ই জুন তারিখে Statesman এ প্রকাশিত কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রী এ, পি, জৈনের বেতার ভাষনে প্রকাশ: "পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে আগত ৩,৩৭ ০০০ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্ব্বসতি দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের জন্য ৮,৪৫,০০০০০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।"

এক দিকে এই ধরণের আত্মসন্তুষ্টিমূলক বিবৃতি ও বেতার ভাষন, অন্য দিকে প্রায় রোজই সংবাদ পত্রের পাতা খুলিলেই চোখে পরে উদ্বাস্তুদের অনাহার, মৃত্যু ও আত্মহত্যা হইতে সুরু করিয়া—রেল লাইন আটকানো, অনশন ধর্ম্মঘট, পুনর্ব্বাসন দপ্তর ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বাড়ীতে অবস্থান ধর্ম্মঘটের নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা। উদ্বাস্তুদের অসহনীয় ক্লেশ এবং সে সম্পর্কে নিদারুণ সরকারী উপেক্ষার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ তাই বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন জায়গায় ছড়াইয়া পরিতেছে এই ভাবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে যদি উদ্বাস্তু সমস্যা প্রায় সমাধান হইয়া থাকে তবে উদ্বাস্তুদের মধ্যে এ বিক্ষোভ কেন? কারণ সরকার পক্ষ হইতে এই ধরণের আত্ম সন্তুষ্টিমূলক যত প্রচার কার্য্যই চলুকনা কেন, এই সমস্ত প্রচারের সাথে বাস্তুহারাদের বাস্তবজীবনের কোন সম্পর্ক নাই। উদ্বাস্তুদের বৃহত্তম অংশের প্রতি সরকার কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই—যাহারা সরকার পরিত্যাক্ত সামরিক ব্যারাক, দাঙ্গা বিধ্বস্ত মুসলমান বস্তী এবং স্বীয় প্রচেষ্টায় গড়া কলোনীগুলিতে দুঃখ কষ্ট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাইতেছেন।

যাহাদের দায়িত্ব সরকার লইয়াছেন অর্থাৎ সরকারী ক্যাম্পকলোনীগুলীর অধিবাসী, তাহারাই সরকারের তথাকথিত পুনর্ব্বাসন পাইয়াছেন। এখন সরকারী বিবৃতি একটু যাচাই করিয়া দেখা যাউক যে ইহাদের যে ভাবে পুনর্ব্বসতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইহারা সমাজ জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন কিনা।

টাকা হয়ত খরচ করা হইয়াছে সত্য কথা কিন্তু টাকার অঙ্কদিয়াই অবস্থা বিচার করা যায়না। টাকাটা কিভাবে খরচ করা হইয়াছে এবং যাহাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে, তাহার নমুনাই বা কি? এই সমস্ত বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

যেকোন উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার আগে খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে, তিনি যে স্তরের উদ্বাস্তু তাহাকে জীবন ধারণের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বিভিন্ন স্কীমের মধ্যে পুনর্ব্বাসন দিতে হইবে। একটি জেলে পরিবারকে যদি এমম স্থানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়, যেখানে নলকুপ ভিন্ন জল পাওয়ার উপায় নাই (মাছ তো দূরের কথা) তবে কি করিয়া সে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যাবস্থা করিবে? ফলে গৃহ নির্ম্মান বা অন্য যে কোন ঋন তাহাদের দেওয়া হউক না কেন তাহা তাহাদের পরিবার বর্গের অন্ন সংস্থানের জন্য ব্যায় করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবারকে ঋন দেওয়া হইয়াছে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার পরিমান গড়ে ২৫০৲ টাকা মাত্র। অবশ্য এই ঋন দানের নীতিও সর্ব্বত্র এক নয় এবং এই ঋনের টাকাও এক সময় পাওয়া যায়না। যেমন, মেদিনীপুরের খয়ের উল্লাবাগ কলোনী—মেদিনীপুর একটী কৃষিপ্রধান অঞ্চল কিন্তু উক্ত খয়ের উল্লা বাগ কলোনীতে পুনর্বাসনের নাম করিয়া স্থান দেওয়া হইয়াছে ২৫০ শত পরিবারকে, যাহাদের অধিকাংশই ব্যাবসাজীবি। স্থানটী বাছা হইয়াছে আবার মেদিনীপুর ষ্টেসনের দুই মাইল দূরে একটি টিলার উপর। জমি শুধু পাথর মাটী প্রায় দেখাই যায়না, নয়টী পাতকুয়া আছে তাতে ৬ ইঞ্চির বেশী জল পাওয়া যায়না। উক্ত ২৫০ শত পরিবারকে horticulture loan দেওয়া হইয়াছে। পরিমান মাত্র ৩০০৲ টাকা। তাহাও তাহারা পাইয়াছেন ৭ কিস্তিতে। দুইটী কিস্তির মধ্যবর্ত্তী সময় হইতেছে ৬ মাস হইতে ১৮ মাস। যে সমস্ত ভাগ্যবান (?) পরিবার উক্ত ঋন পাইয়াছেন তাহাদের মধ্যে কয়েকটী পরিবার উক্ত সময়ের মধ্যে পাইয়াছেন ৪৲ টাকা মাত্র। এই ভাবে ঋণ দেওয়ার ফলে যে সামান্য টাকা পরিবারগুলি ঋণ বাবদ পাইয়াছে, অন্ন সংস্থানের কোন সুযোগ না থাকার ফলে, গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যায়ও তাহাতে কুলায় নাই।

অথচ সরকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে একটি পরিবারকে গ্রামে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গড়ে প্রায় ১৪০০৲ টাকার প্রয়োজন। (Rehabilition Review —No 1—1949) আবার সরকারী মতে যেরূপ উদ্বাস্তু পুনর্ব্বসতির জন্য ব্যয় করা হইয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যয় করা হয় নাই। পুনর্বাসন বিভাগের খরচ পোষাইবার জন্যই এই টাকার একটা মস্ত বড় অঙ্ক ব্যায় হইয়া যায়। আর সে টাকার অধিকাংশ ব্যয় হয় হিরন্ময় ব্যানার্জী, পুনর্বাসন উপমন্ত্রী পুরবী মুখার্জীর ভাগ্যবান স্বামী মহাশয়ের প্রভৃতি বৃহৎ হস্তীদের খরচ পোষাইবার জন্য। বাকী যে টাকা উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যায় করা হইয়াছে সরকারী মতে, তাহারও একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হইতেছে মেদিনীপুরের "খড়ের বন কলোনী"। সরকারী হিসাবে উক্ত কলোনীতে ৮০টী পরিবার কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ৪০টী পরিবার উক্ত কলোনীতে বাস করেন। স্থানীয় রিলিফ অফিসার শ্রীবিনোদ মান্না নিয়মিত ভাবে পুনর্বাসন বিভাগ হইতে ৮০টী পরিবারের জন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য দিকে শ্রীরাসবিহারী চক্রবর্ত্তী নামক উক্ত কলোনীর একজন অধিবাসীর স্ত্রী অন্নাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাহার বয়স্কা কন্যা বস্ত্রের অভাবে বাড়ীর বাহির হইতে পারেন না। নিজে তিনি ভিক্ষা করিয়া পরিবার বর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন। উক্ত কলোনীতেই চাষীদের যে কৃষি ঋণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা লাঙ্গল ও বলদ কিনিয়াছে কিন্তু সরকারী অব্যবস্থার জন্য তাহারা আজও জমি পায় নাই। ফলে লাঙ্গল-বলদ বেচিয়া ফেলিয়া অন্ন সংস্থান করিতে হইয়াছে।

তাহা ছাড়া জমি একুইজিসন ও কলোনীর স্থান নির্বাচনের ব্যাপারেও সরকারী চরম অবিমৃশ্যকারীতার পরিচয় পাওয়া যায়। জমি একুইজিসনের ব্যাপারে জমিদার ও জোতদারদের জমি একুইজিসনের পরিবর্ত্তে কৃষক ও মধ্যবিত্তদের জমি একুই জিসন করা হয়। ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে বাস্তুহারাদের প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া ওঠেনা। কলোনী গড়িবার জন্য স্থান নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে বাস্তুহারা প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রতিনিধির সহিত পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাহা না করার ফলে এক দিকে চাষ করিবার অনুপযুক্ত জমিতে চাষের ব্যবস্থা এবং মধ্যবিত্ত এবং চাকুরী জীবিদের কৃষি অঞ্চলে পুনর্ব্বসতি ব্যবস্থায় পুনর্ব্বসতি কার্য্যকরী হয় না, অন্যদিকে চাষের জমি দখল করার ফলে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয় এবং উদ্বাস্তুদের সাথে অসহযোগীতা সুরু করে। তাহা ছাড়া মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবিরা বেকার থাকার ফলে যে কোন মূল্যে তাহাদের শ্রম বিক্রয়ের জন্য তৈরী থাকে, ফলে কোন কারখানা বা অফিসে শ্রমিক কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করিলে

ীতি—বাস্তুহারা সমস্যা এড়াইয়া যাইবারই নতুন চক্রান্ত ★

উদ্বাস্তুদের মধ্য হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মঘট বানচাল করিবার প্রচেষ্টা হয় এবং বহুলাংশে এই প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হয়। এ ছাড়া রহিয়াছে প্রতিক্রীয়াশীল শক্তির উস্কানী—ফলে "বাঙ্গাল"—"ঘটী"র কলহ হয় সুরু। কলোনীর স্থান নির্ব্বাচনের ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারনের সাথে পরামর্শ না করার ফলে অধিকাংশ সরকারী কলোনী গুলিই বসবাসের অনুপযোগী এবং উপ-জীবিকার কোন রাস্তা নাই। এই সমস্ত কারণেই দেখা গিয়াছে যে সরকারী পুনর্ব্বাসন কেন্দ্র হইতে দলে দলে পুনরায় আশ্রয়চ্যুত হইয়া হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই দেখা গিয়াছে বিহার এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে প্রেরিত ২৪ হাজার উদ্বাস্তুর মধ্যে ১৬ হাজার উদ্বাস্তু পশ্চিম বাংলায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

যে সমস্ত উদ্বাস্তুর দায়িত্ব সরকার লন নাই, তাহারা যখন দেখিল যে বিভিন্ন রেল ষ্টেসন এবং পশ্চিম বাংলার পথে প্রান্তরে ভিন্ন তাহাদের ঠাঁই মিলিবেনা তখন তাহারা সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের পথ নিজেরা বাছিয়া লইল। সামরিক পরিত্যক্ত ব্যারাক মুসলমান পরিত্যক্ত বস্তী এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত বিলাসী ধনী বাবুদের শূন্য বাগান বাড়ীতে তাহারা মাথাগুজিবার জায়গা করিয়া লইল। এই সমস্ত জায়গায় যাহাদের জায়গা হইলনা, তাহারা ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে জমিদার ও ল্যাণ্ড-স্পেকুলেটারদের শত শত বছরের পতিত জমিতে নিজেদের চালাঘর তৈরী করিল। গড়িয়া উঠিল নূতন নূতন উপনিবেশ। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম তৈরী করিবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই তাহারা ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করিয়া তুলিল। হাট—বাজার, হাসপাতাল, ক্লাব, স্কুল—কলেজ প্রভৃতি সামাজিক জীবনে যাহা কিছু প্রয়োজন, সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেদের প্রচেষ্টায় তাহারা সবই গড়িয়া লইল। যেখানে ছিল সাপ শিয়ালের আড্ডা ২।৩ বৎসরের মধ্যেই সেখানে নতুন জীবনের স্পন্দন অনুভূত হইল।

জনসাধারণ আশা করিয়াছিল বাস্তু-হারাদের এই প্রচেষ্টাকে সরকার অভিনন্দন জানাইবে এবং প্রয়োজন অনুসারে এই সমস্ত উপনিবেশ গুলিতে সরকার সাহায্য করিবে। কিন্তু সরকারী নীতি কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হইল। এই সরকার জমিদার গোষ্ঠীর তাই তাহাদের স্বার্থরক্ষার ন্য সরকার তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিল। তাই দেখা গেল পাইকারী ভাবে বিভিন্ন কলোনীতে দিনের পর দিন চলিতে লাগিল জমিদারের গুণ্ডা ও পুলিসের যুক্ত হামলা, বাস্তুহারা নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার ও হয়রাণী হইতে লাগিলেন। বহু কলোনী পুলিস ঘিরিয়া রাখিল। একই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি হইল ব্যারাক-বস্তীর অধিবাসী বাস্তুহারাদের উপর। পুলিস ও গুণ্ডার হামলা এবং হয়রাণী হইল। নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এই সমস্ত হামলার বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদে বাস্তুহারারা নিজ নিজ অঞ্চলে এবং কেন্দ্রীয় ভাবে সংগঠন গড়িয়া তুলিল। তাহাদের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনই তাহাদের সেদিন রক্ষা করিল। সরকার বুঝিতে পারিল যে অত্যাচার দ্বারা বাস্তুহারাদের উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। তাই সরকার বাস্তুহারা উচ্ছেদের জন্য নূতন পথ গ্রহণ করিল। জমিদারদের স্বার্থে বাস্তুহারা-দের উচ্ছেদের জন্য সরকার "বাস্তুহারা পুনর্ব্বাসন ও অননুমোদিত দখলীকৃত জমি হইতে ব্যক্তিগণের উচ্ছেদ আইন, ১৯৫১" নামে নূতন আইন রচনা করিল। এই আইনকে রদ করিবার জন্য বাস্তুহারারা তাহাদের কেন্দ্রীয় সংগঠনে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারারা পরিষদ (U. C. R. C.) এর নেতৃত্বে আন্দোলন সুরু করিল।

আইনটী গৃহিত হওয়ার পরেই এই আইনের সাহায্যে সুরু হইল উচ্ছেদ নোটিশ আর কম্পিটেন্ট অথরিটী কোর্টের হয়রাণী, বিভিন্ন ক্যাম্পে ক্যাম্পের জল আলোর ব্যবস্থা নষ্ট করিবার প্রচেষ্টা। ক্ষোভের কথা যে তবু এই ফ্যাসীবাদী সরকারের পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রী এ, পি, জৈন পূর্ব্ব বঙ্গের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে পার্লামেণ্টের বিগত অধিবেশনে নির্লজ্জের মত ঘোষণা করিয়াছেন "Displaced Persons are living, marrying and producing children."

– অর্থাৎ বাংলা দেশে 'উদ্বাস্তু সমস্যা' নামে কোন সমস্যা আছে, একথা তিনি স্বীকার করিতেই রাজী নন।

এই 'উচ্ছেদ আইনের" বলে বাস্তু-হারাদের প্রচুর হয়রানী করা হইল কিন্তু একটি ক্ষেত্রেও বাস্তুহারাদের সংঘশক্তির জন্য তাহাদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হইল না। ইতিমধ্যে নির্ব্বাচনের পর পশ্চিম বাংলায় নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হইল। এই মন্ত্রী-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী রেনুকা রায় গত ১৮ই জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে এবং ১লা আগষ্ট বিধান পরিষদের বিবৃতিতে সরকারের নূতন পুনর্ব্বাসন নীতি ঘোষনা করিয়াছেন। উক্ত বিবৃতি এবং সাংবাদিক সম্মেলনের রিপোর্ট পড়িলে আপাতঃ দৃষ্টিতে বাস্তুহারাদের উপর নতুন পুনর্ব্বাসন মন্ত্রীর গভীর মমতাবোধের পরিচয় আছে বলিয়া মনে হয়। বিবৃতিতে জোরদখল কলোনীগুলিকে আইনগত স্বীকৃতি দানের যৌক্তিকতা স্বীকার করা হইয়াছে, সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেদের প্রচেষ্টায় গড়া এই কলোনীগুলির অধিবাসীদের স্বাবলম্বী মনোভাবেরও যথেষ্ট প্রশংসা করা হইয়াছে, বর্ত্তমান বাজার দর যে জমিগুলির ন্যায্য মূল্য নয় তাহাও স্বীকার করা হইয়াছে, তবুও মাননীয়া পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী রেনুকা রায়ের সরকারী পুনর্ব্বাসন নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে একথা পরিস্কার বোঝা যায় যে এই নীতি সামগ্রীক ভাবে বাস্তুহারা পুনর্ব্বাসনের দায়িত্ব এড়াইয়া যাইবার এবং বাস্তুহারাদের মধ্যে বিভেদ, বিভ্রান্তি এবং মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করিবার এক নবতম চক্রান্ত।

বিবৃতিতে ১৩০টী কলোনীর অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে আবার ৩৭টী কলোনী বেশী মূল্যের অজুহাত তুলিয়া ভারাটীয়া বাড়ীতে স্থান দেওয়া হইবে বলা হইয়াছে—অথচ পশ্চিম বঙ্গে বাস্তুহারাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় ২৫০ শতাধিক কলোনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

বিবৃতিতে ৪৬ সালের মূল্যকে ন্যায্য মূল্য হিসাবে ধার্য্য করা হইয়াছে। অথচ এই কলোনীগুলির অধিকাংশ পতিত জমি। এই জমি হইতে মালিকদের কোন আয় হইত না—জাতীয় অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রেও কোন উপকার হইত না। এমনকি কোন কোন কলোনীর জমির বর্ত্তমান মূল্য ৪৬ সাল হইতেও কমিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় যুদ্ধপূর্ব্ব দরের পরিবর্ত্তে ৪৬ সালকে মান ধরিলে কলোনী বাসীর পরিবর্ত্তে জমিদারদের স্বার্থই রক্ষা করা হইবে।

বিবৃতিতে কলোনী গুলিকে আইন সিদ্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও "বাস্তুহারা পুনর্ব্বাসন ও অননুমোদিত দখলীকৃত জমি হইতে ব্যাক্তিগণের উচ্ছেদ আইন ১৯৫১" আইনটী তুলিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, এই আইনের বলে নিযুক্ত কম্পিটেন্ট অথরিটী কর্ত্তৃক দেওয়া নোটীশ, বাস্তুহারাদের কোর্টে তলব এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মামলা দায়ের করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার কিংবা স্থগিত রাখিবার আশ্বাস পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই।

বিবৃতিতে বাস্তুহারাদের Bonafide এবং Malafide এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। অথচ সরকারের প্রদত্ত উপযুক্ত বাস্তুহারার (Bonafide) সংজ্ঞা উদ্বাস্তু সমস্যাকে জনসাধারণের সামনে আরও ছোট করিয়া দেখানো ভিন্ন কিছুই নয়। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী এক বিরাট সংখ্যক বাস্তু-হারাকে বাদ দিবার চক্রান্ত হইয়াছে এবং নতুন ভাবে বাস্তুহারার মধ্যে বিভেদকে উস্কানী দেওয়া হইবে।

বিবৃতিতে ক্যাম্প-বস্তী ব্যারাকের কয়েক লক্ষ বাস্তুহারা এবং তথাকথিত অধিক মূল্যের ৩৭টী কলোনীর অধিবাসীদের সম্পর্কে "টেনেমেণ্ট" বা ভারাটীয়া প্রথায় বসবাসের কথা বলা হইয়াছে উদ্বাস্তুরা পূর্ণাঙ্গ পুনর্ব্বসতি চায়। যেখানে অন্ন সংস্থানই কষ্টকর, সেখানে চিরকাল কয়েক লক্ষ বাস্তুহারা ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করিবে —ইহা অযৌক্তিক। তাহাছাড়া জমিদার ও ধনীদের মুক্তি দিয়া ভাড়া বাড়ী তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় কোটী কোটী টাকা সাধারণ গরীব নাগরিকদের রাজস্ব হইতে ব্যয় করা হইবে—ইহা অবান্তর। তাই বাস্তুহারারা পুনর্ব্বসতির পরিবর্ত্তে "টেনেমেণ্ট প্রথা"র কথা ভাবিতেও পারে না।

কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের উদ্বাস্তুদের পর্য্যবেক্ষন করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রীমতী রেনুকা রায়ের ঘোষিত পুনর্ব্বাসন নীতিই নূতন ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের যে পুনর্ব্বাসন নীতি তাহা বাস্তুহারাদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের ইঙ্গিত দেয় না। বাস্তু-হারাদের পশ্চিম বঙ্গের সমাজ জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রের মান উন্নয়নের অঙ্গ হিসাবে বাস্তুহারা সমস্যা সমাধানের দিকে অগ্রসর হইলেই বাস্তুহারা-দের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন সম্ভব। সেজন্য প্রথমেই প্রয়োজন মূল্য নির্ব্বিশেষে বাস্তুহারাদের প্রচেষ্টায় গড়া সমস্ত কলোনীগুলি স্বীকার করিয়া লওয়া। জমি বন্দোবস্তের জন্য বাস্তুহারা প্রতিনিধি ও জমিদারের প্রতি-নীধির সহযোগীতায় সরকারেরই উদ্যোগী হইয়া কিস্তিবন্দীতে দাম পরিশোধ করা। জমির দাম কোন ক্ষেত্রেই যুদ্ধ-পূর্ব্ব দামের বেশী হওয়া উচিৎ নয়।

অবিলম্বে সমস্ত চাষোপযোগী পতিত জমি দখল করিয়া তাহা পূর্ব্ব বঙ্গের বাস্তু-হারাদের ও পশ্চিম বঙ্গের ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। বিনা বা নাম মূল্য সুদে কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে চাষীরা অতি সল্প সময়ের মধ্যেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বার্ড কোম্পানীর শ্রমিকদের দাসপ্রথা বিরোধী অন্দোলন

বার্ড এ্যাণ্ড কোম্পানীর কলিকাতাস্থ শ্রমিকদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। একমাত্র কলিকাতায় বার্ড এ্যাণ্ড কোম্পানীর খিদিরপুর, আরমেনিয়ান ঘাট, জগন্নাথ ঘাট, নিমতলা, মেটিয়াবুরুজ প্রভৃতি জায়গায় চা এর কারবারে জাহাজ হইতে মাল উঠানামা করার জন্য বিভিন্ন ঠিকাদার সর্দ্দারের অধিনে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক এবং কোম্পানীর দ্বারা সরাসরি নিযুক্ত আড়াই শত শ্রমিক কাজ করে।

ঠিকাদার সর্দ্দারের অধীনে যে বিরাট অংশ শ্রমিক নিযুক্ত হয় তাঁদের দুর্দ্দশা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

ঠিকাদার সর্দ্দারের উপর প্রয়োজন মত শ্রমিক আমদানীর Contract দিয়া নির্বিকারভাবে শ্রমিকের রক্ত একদিকে কোম্পানী অন্যদিকে সর্দ্দাররা মিলিতভাবে পান করেন। রক্তচোষা সর্দ্দাররা শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ এবং বরখাস্ত দু'টাই মৌখিকভাবে করে থাকেন।

চা-এর মুরসমে শ্রমিকদের প্রতিদিন ১২-১৩ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। অতিরিক্ত কাজের জন্য কোন over time মিলে না। জাহাজ হইতে পেটী মাথায় করিয়া সরাসরি তিনতলার গুদামে যারা মাল তোলে শতকরা ৮ টাকা ধার্য্য আছে। আর যারা জাহাজ হইতে মাল তুলিয়া মাঝখানে একতলার গুদামে রাখিয়া আবার তিনতলায় মাল তুলিয়া দেয় তাদের ৭॥ টাকা ধার্য্য। এছাড়া এখান হইতে সেখানে বা গুদামে মাল সাজাইয়া রাখা প্রভৃতির জন্য ৫৲, ৪৲, ও ৩৲ টাকা যথাক্রমে ধার্য্য আছে। এ সবই শতকরা পেটি পিছু ধার্য্য আছে, কিন্তু শ্রমিকদের ভাগ্যে তাও মিলে না। কেননা প্রত্যেক শ্রমিককে তাদের প্রতিদিনের আয় হইতে টাকা প্রতি এক আনা করিয়া সর্দ্দারকে কমিশন দিতে হয় এবং সর্দ্দার নিজের ডাগা, আর পালোয়ান, ড্রাইভার, ঠাকুর প্রভৃতির 'ডাগা' কাটিয়া নেয়। এছাড়াও হপ্তার দিন প্রতি শ্রমিককে টাকা প্রতি দুই আনা করিয়া মুন্সিয়ানা সর্দ্দারকে দিতে হয়। এখানেই শেষ নয়, সর্দ্দারের কাছ থেকেই সব শ্রমিককে রেশন নিতে হয় আর সপ্তাহে ৩॥০ সের (একসের চাল ও ২॥০ সের গমের) রেশনের জন্য কমপক্ষে দুই টাকা এবং কোন কোন শ্রমিককে ২৷৵ আনাও দিতে হয়। রেশনের সরকারী দামের উপরে এই সব সর্দ্দারী দামের মূল্য শ্রমিকদেরই জোগাইতে হয়।

শোষণের বেড়াজাল আর অত্যাচারের নির্ম্মম নিষ্পেষন দুর করার জন্য কলিকাতার বার্ড এ্যাণ্ড কোং শ্রমিকরা একটি শক্তিশালী ও সংগ্রামী ইউনিয়ন কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এম-এল-এ কে সভাপতি ও কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জীকে সম্পাদক করিয়া কয়েকমাস পূর্বে গঠন করিয়াছে।

বার্ড শ্রমিকদের সমস্ত অভাব অভিযোগ দুর করার জন্য ইউনিয়ন একটি দাবীর তালিকা প্রস্তুত করিয়া ইতিমধ্যেই সেক্সনাল অফিসার, হেড অফিসের বড় সাহেব সরকারী শ্রমদপ্তর ও শ্রমমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করিয়াছে। দাবীর তালিকার প্রধান বিষয় হইতেছে প্রথমতঃ কলিকাতার বার্ড এ্যণ্ড কোং শ্রমিক ইউনিয়নকে কোম্পানীকে শ্রমিকদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে মানিয়া লইতে হববে। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত ঠিকাদারী দাস-প্রথা প্রত্যাহার করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ সমস্ত শ্রমিককে কোম্পানীকে সরাসরি নিয়োগ করিতে হইবে প্রভৃতি।

এ যাবৎ বার্ড শ্রমিকদের এই সমস্ত ন্যায় সঙ্গত দাবীর কোন উত্তরই কি সেকশনাল অফিসার, কি হেড অফিস, বা সরকারী শ্রমদপ্তর হইতে না আসায় গত ২২শে সেপ্টেম্বর খিদিরপুরে সেক্শনাল অফিসারকে বেলা ১১॥ টায় প্রায় সহস্রাধিক শ্রমিক ঘেরাও করে। প্রায় দু'ঘণ্টা ঘেরাও চলার পর সেক্শনাল অফিসার প্রতিশ্রুতি দেন যে ৪ দিনের ভেতর হেড অফিসের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া শ্রমিকদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে কী করা হইবে জানাইবেন। চারদিনের জায়গায় ৭ সাত দিনের ভেতরও কোন সংবাদ না আসায় ৭ই অক্টোবর বেলা ৩টার সময় দেড় হাজারবার্ড শ্রমিক ডালহাউসিতে বার্ড কোং হেড অফিসে উপস্থিত হয়। শ্রমিকরা ডালহাউসির প্রাসাদ কাঁপাইয়া আওয়াজ তোলেন "কলিকাতা বার্ড এ্যাণ্ড কোং শ্রমিক ইউনিয়নকে মান্‌তে হবে"। "ঠিকাদারী প্রথা তুলে দাও।" "কোম্পানী হইতে সরাসরি চাকুরী ও মাহিনার ব্যবস্থা কর।

বার্ড এ্যাণ্ড কোং এর হেড অফিসের বড় সাহেবের সঙ্গে শ্রমিকদের তরফ হইতে ইউনিয়ন সম্পাদক কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী সহ ১০ জন প্রতিনিধি শ্রমিকদের দাবীর তালিকা লইয়া সাক্ষাত করিলে বহু আলোচনার পর কোম্পানীর বড় সাহেব প্রতিশ্রুতি দেন যে, সমস্ত দাবী কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডে পেশ করিবেন এবং এক সপ্তাহের ভেতর কোম্পানীর উত্তর ইউনিয়নকে জানাইবেন। কিন্তু শ্রমিকরা ইহাতে সন্তুষ্ট হন না। প্রায় ৬টা পর্য্যন্ত অফিস ঘেরাও করিয়া রাখার পর কোম্পানীর তরফ হইতে সেকশনাল অফিসার ঐদিন ধর্মঘটের জন্য কাহাকেও বরখাস্ত করা হইবে না প্রতিশ্রুতি দিলে এক বিশাল শোভাযাত্রা করিয়া খিদিরপুরের কয়লা সড়করোডে অবস্থিত ইউনিয়ন অফিসের সম্মুখে আসিয়া সভা করে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব নেওয়া হয়—একজনকেও যদি বরখাস্ত করা হয়, তবে আবার ধর্মঘট করা হইবে এবং আগামী ৮ই অক্টোবর হইতে উজানীয়া জাহাজীদের ধর্মঘটের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানান হয়।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ্র কর্ত্তৃক ২৩, ডিক্সন্ লেন পরিবেষক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।

আন্দোলনের পথেই বাস্তহারা সমস্যার সমাধান

(তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পারে। বাসের জন্য সমস্ত জঙ্গলাকীর্ণ পতিত জমি দখল করিতে হইবে।

মুসলমান উদ্বাস্তদের বাড়ীতে অবস্থিত বাস্তহারাদের অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের নিজ জায়গায় ক্ষতিপূরণ সহ পুনপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

বেকারদের চাকুরীর সংস্থানের জন্য কলোনীগুলির কাছাকাছি ছোট ছোট শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেখানে তাহারা আয়ের পথ করিয়া লইতে পারে। তাহা ছাড়া উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য দ্বারা ব্যাবসার পথ সুগম করিয়া দিতে হইবে।

বাস্তহারা পুনর্ব্বাসনের জন্য উপরোক্ত পথগুলি সরকার গ্রহণ করে নাই—করিতে পারে না। কারন মূল্য নির্ব্বিশেষে কলোনী গুলি স্বীকার করিতে হইলে এবং সমস্ত পতিত জমি দখল করিতে হইলে যেমন জমিদারদের স্বার্থে আঘাত লাগে ঠিক তেমনি শিল্পের সম্প্রসারনের মধ্য দিয়া শিল্পপতিদের মুনাফার ক্ষতি হয়। কংগ্রেস সরকার জমিদার ও কলওয়ালাদের প্রতিনিধি সুতরাং তাহাদেরই স্বার্থরক্ষা করিবে। তাই এ সরকারের নিকট হইতে উদ্বাস্ত সমস্যা সমাধানের আশা করা নিরর্থক। তবে বাস্তহারাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার পথ কি? যে পথের ভয়ে সরকার আজ আর সোজা সুজি হামলার মধ্য দিয়া বাস্তহারাদের উচ্ছেদ করিতে সাহসী হয় না, যে পথের ভয়ে বাস্তহারাদের দাবীগুলি সরকার আজ যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে, সেই পথই বাস্তহারাদের পুনর্ব্বাসনকে সুষ্ঠুভাবে সমাধান করার একমাত্র পথ। সে পথ হইল পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তির সহযোগীতায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথ।

বাস্তহারা সমস্যা সমাধানের জন্য যখন প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ বাস্তহারা আন্দোলন, তখন হঠাৎ দেখা গেল, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী এ, পি, জৈনের পশ্চিমবঙ্গে আসিবার কয়েক দিন পূর্বে ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে কয়েকটী দল কেন্দ্রীয় বাস্তহারা সংগঠন "সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তহারা পরিষদের" পাল্টা সংগঠন হিসাবে "সংযুক্ত বাস্তহারা পুণর্বাসন পরিষদ" নামে একটি নতুন সংগঠন গঠন করিল। সম্মিলিত বাস্তহারা পরিষদের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাম্প ও কলোনীর প্রতিনিধি ছাড়াও ৮টীবামপন্থী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি আছেন। উভয় সংগঠনের আজ উচিৎ পরস্পর আলোচনার মধ্য দিয়া একটি সুসংবদ্ধ কেন্দ্রীয় বাস্তহারা প্রতিষ্টান গঠন করা। সাথে সাথে প্রতিটি ক্যাম্প কলোনী হইতে এ আওয়াজ উঠাইতে হইবে যে বাস্তহারাদের স্বার্থে তাহারা এই বিভেদকে বরদাস্ত করিবেনা। কিন্তু "ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চাই" বলিয়া চীৎকার করিলেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। পরিস্কার করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে ঐক্যবদ্ধ হইব কেন তাহার ভিত্তি কি? ঐক্যবদ্ধ শুধু ঐক্যবদ্ধতার জন্য নয়—দাবীকে জয়যুক্ত করিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। আর একটা প্রশ্ন হইতেছে যে আন্দোলন কার বিরুদ্ধে এবং এই আন্দোলনের রূপই বা কি হইবে? জমিদারের পতিত জমিতে নূতন কলোনী গড়িয়া তুলিতে হইলে এবং জমিদারের গুণ্ডার হামলার বিরুদ্ধে কলোনী রক্ষা করিতে হইলে দেখা যায় জমিদারকে সাহায্য করে সরকারী ফৌজ এবং সরকারী আইন। বাস্তহারাদের উচ্ছেদের জন্য নূতন আইন তৈরী হইতে পারে আর তাহাদের পুনর্বাসনের জন্য আইনের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা সম্ভব নয় যেহেতু তাহা জমিদারের স্বার্থে আঘাত লাগে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আপাতঃ দৃষ্টিতে যে লড়াই জমিদারের বিরুদ্ধে, তাহা মূলতঃ সরকারের বিরুদ্ধেই। আর আন্দোলনের রূপ কি হইবে তাহা অবস্থা ও প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে। প্রাথমিক অবস্থা হইতে ধাপে ধাপে আন্দোলন আগাইয়া লইতে হইবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষীতে সাংগঠনীক প্রস্তুতি অনুসারে সভা-সমিতি ও মিছিল হইতে সুরু করিয়া বিভিন্ন দপ্তর ও ভার প্রাপ্ত কর্ম্ম কর্ত্তাদের ঘেড়াও করা সব কিছুই চলিতে পারে।

এই সমস্ত কার্য্য সূচীর ভিত্তিতে যারা বাস্তহারার দাবী আদায়ের জন্য অগ্রসর হইবেন, তাহাদের লইয়াই হইবে ঐক্যবদ্ধ বাস্তহারা আন্দোলন। এই দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণ বাস্তহারাকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে।

ক্যানিং থানার চাষীদের অসহায় অবস্থা

(সংবাদ দাতার পত্র)

২৪ পরগণা জেলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল গুলিতে সরকারী সাহায্য দান সম্পর্কে ঘটা করিয়া মাঝে মাঝে ঘোষণা করা হইয়া থাকে যে সরকারী (ও কংগ্রেস পরিচালিত) সাহায্যাদির কল্যানে সে অঞ্চলের লোকেরা এখন সুখে শান্তিতে বাস করিতেছে! ক্যানিং থানার জনসাধারণের বিবিধ অসুবিধা ও দুর্দশা সম্পর্কে নানাপ্রকার অভিযোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাসন্তী ইউনিয়নে টেষ্ট রিলিফের মারফৎ বিশেষ কোন কাজ এ যাবত করা হয় নাই ফলে, ক্রয় ক্ষমতার অভাবে আংশিক রেশন ব্যবস্থায় তাহারা বিশেষ উপকার পাইতেছে না। নাটুদহ ষ্টেটের অন্তর্গত কুলতলী, পাল্লার খাল, মালসাভাঙ্গী, বরাগাদা প্রভৃতি খালগুলি অসংখ্য প্রজা সাধারণকে বঞ্চিত করিয়া ও গো-মহিষাদি প্রতিপালনের বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া কয়েকজন সুবিধাবাদী ব্যক্তিকে মাছ চাষের জন্য পাট্টাই বন্দোবস্তে বিলি করা হইয়াছে। ঐ খালগুলি এতদঞ্চলে শস্যক্ষেত্রের জল পাশ করিবার এক মাত্র পথ।

কৃষি লোন ও ক্যাটল পারচেজ লোন কিছুই উক্ত অঞ্চলে সঠিকভাবে মিলে নাই।

সরকারের দৃষ্টি উপরিউক্ত দুর্দ্দশা ও অব্যবস্থাগুলির প্রতি বিশেষভাবেই আকর্ষণ করা যাইতেছে এবং এই সমস্ত ব্যাপারে সরকারের আশু হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।